গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার(Abstract)

ভূমিকা

বাংলা তথা বিশ্বগদ্যসাহিত্যের জনপ্রিয় শিল্প সংরূপ ছোটগল্প। ছোটগল্প সীমায়িত দর্পণে বিশ্বদর্শন। যদিও গল্পকথার শুরু হয়েছিল অনেক আগে। সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তনের ধারায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের গল্প বলা ও শোনার অদম্য আগ্রহ। প্রাচীন যুগের গল্পগুলি মূলত তৈরী হয়েছিল দৈবিক-আধিদৈবিক বা প্রাকৃতিক প্রভৃতি যে কোনরকম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য, সেই সব গল্পগুলি ছিল শ্রুতি নির্ভর। এই ধরনের শ্রুতি-নির্ভর গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে — Fable বা উপকথা, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, Fairy Tale বা রূপকথার গল্প প্রভৃতি।

সাহিত্যের পরিভাষায় থাকে আমরা Short Story বা ছোটগল্প বলে থাকি — তা একটা স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক সাহিত্য-সংরূপ। এর সঙ্গে প্রাচীন যুগের উপকথা বা রূপকথার গল্পের যেমন কোন সাদৃশ্য নেই, তেমনি পরবর্তীকালে দেশে বিদেশের সাহিত্যে যাকে নভেলেট বা বড়গল্প বলা হয়ে থাকে তার সঙ্গেও কোন মিল নেই। ছোটগল্প উনবিংশ শতাব্দীর একটি আশ্চর্য ফসল — 'A peculiar product of nineteenth century'.

সাহিত্যের এই সর্বাধিক দ্বন্দ্ব-মতান্তর এবং সমালোচিত শাখা ছোটগল্প বা short story অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প আমরা পাই উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তবে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম বা উদ্ভব নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। ১২৭৯-৮০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক তথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা' কিংবা 'যুগলাঙ্গরীয়'-কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক প্রথম ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করেছেন — তবে একথাও ঠিক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই দুটি রচনাকে কখনোই ছোটগল্প বলে আখ্যা দেন নি — বরং তিনি এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস বলেই আখ্যা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন শিল্পী — যাঁর হাতে যে কোন শাখার সাহিত্যই পুষ্পে পুষ্পে চতুর্গুণ বিকশিত হয়েছে। আর ছোটগল্পের কথাতো বলাই বাহুল্য — তিনি শুধু ছোটগল্পের জনকই নন, তাঁর হাত ধরেই বাংলা ছোটগল্প ভ্রূণের খোলস থেকে বেরিয়ে শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত

করে যৌবনের ডালি নিয়ে শাখায়-শাখায়, বৃন্তে-বৃন্তে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদপুষ্ট ও তাঁর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আর্বিভূত হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচেন্দ্রর পর বাংলা ছোটগল্পের অঙ্গনে পা রাখলেন তিনি বিশিষ্ট ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম তথা রাজশেখর বসু। এঁরা স্ব-স্ব প্রতিভা এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের মাধ্যমে ছোটগল্প রচনা করে পাঠক কুলকে যেমন বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিয়েছিলেন, তেমনি সমাজের কাছে অনেক নতূন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এরপরই এল বাংলা ছোটগল্পের সেই পালা বদলের বেলা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক। রবীন্দ্রনাথকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে, তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রেখে সেই সময় একদল তরুণ লেখক সম্পূর্ণ রূঢ়-কঠিন বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে সমকালীন নানা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিজেদের লেখনীকে প্রসারিত করলেন নতুন ভাবে, নতুন রীতিতে, নতুন বিষয়ে গল্প রচনার জন্য। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসুর মত তরুণ লেখকেরা সাহিত্য তথা ছোটগল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তবে 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি'-পত্রিকা ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও এক ঝাঁক তরুণ তুর্কি উঠে এসেছিলেন। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকা অবলম্বন করে নিজেদের রচিত ছোটগল্পকে পাঠকের দরবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে সকল ছোটগল্পকার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, অন্নদাশংকর রায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ।

এরপর বাংলা ছোটগল্প আবার নতুন বাঁক নিল বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও দেশভাগের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাকে সাক্ষী রেখে। সাহিত্যের অন্যান্য সব ধারার মতোই ছোটগল্পেও যুক্ত হল Post War -এর তক্‌মা। এই ধারার পুরোধা পুরুষ হলেন সুবোধ ঘোষ। এই কালপর্বেই এক সঙ্গে উঠে এলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরীর মত একঝাঁক প্রতিভাবান ছোটগল্পকার। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাময় ঐশ্বর্য নিয়ে ছোটগল্পে নব দিগন্তে উন্মোচন করলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর মত মহান সাহিত্যিক তথা ছোটগল্পকার উঠে এসেছিলেন এই সময়ের ধারাতেই। সমকালের অন্যান্য ছোটগল্পকারদের থেকে স্বতন্ত্র বিষয় ও আঙ্গিক এবং বাক্‌রীতির বৈচিত্র্যে তাঁর ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য আস্বাদী।

প্রথম অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি

কোন শিল্পী - সাহিত্যিকের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে পর্যালোচনা করতে গেলে তার অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে এসে যায় সেই শিল্পী - সাহিত্যিকের জীবন। সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে জানতে গেলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে স্রষ্টাকে জানা। স্রষ্টা তথা ব্যক্তি মানুষটিকে না জানলে তাঁর সৃষ্টিকে জানা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে থাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-অনুভব-উপলব্ধি। তাই ব্যক্তি মানুষটিকে উপেক্ষা করে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর বিশেষ করে যাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা, সেই প্রবাদ-প্রতীম সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টির পর্যালোচনার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন জেনে নেওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের তীব্র বাঙালী-বিদ্বেষের অন্যতম ফসল বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াস অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলাদেশ সহ সারা ভারতবর্ষে যখন উত্তাল কলরোল, যখন ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে বাঙালীর জাগ্রত জাতীয়তাবোধ তীব্র আকার ধারণ করে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের সাড়া দেয় সেই উত্তাল সময়ে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিজয়াদশমীর দিন বাংলাদেশের সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে অনেকটা দূরে, পূর্ব বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত বাঙালী-অধ্যুষিত পাড়া ভাট্টাবাজারের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম হয়। এরকম একটি পরিবেশে সতীনাথ বেড়ে উঠেছিলেন, যেখানে শিক্ষার প্রাধান্য সর্বাধিক।

ভাট্টাবাজারের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সতীনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। এরপর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সতীনাথ ছিলেন স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র। নিয়ম-নিষ্ঠা, সদাচার এবং অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি স্কুলের সকলের নজরে আসেন। শিক্ষক থেকে শুরু করে স্কুলের সকল ছাত্র-সহপাঠীরা তাকে বলত 'ক্লাস কি রশনি'। প্রত্যেক বছর ক্লাসের সকল ছাত্রকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হতেন। এই মেধাবী ছাত্রটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের নাম উজ্জ্বল ক'রে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকে শুরু হয়েছিল সতীনাথের ছাত্র জীবন। তারপর ১৯৩০ সালে এম. এ.

এবং ১৯৩১ সালে পাটনা আইন কলেজ থেকে এল. এল. বি. পাশ করে আক্ষরিক অর্থে ছাত্র জীবন শেষ করে পিতার সুযোগ্য পুত্র হিসাবে সতীনাথ ওকালতিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু অন্তরের কোন এক অজানা আকর্ষণে এই নির্ঝঞ্ঝাট-আয়েসী জীবন তাঁকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারে নি।

১৯৩৯ সালটি সতীনাথের জীবনের পর্বান্তরের কাল। এই বছরই সতীনাথ নিজের জীবনের দু-দুটো বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অথচ দুটোর কোনটিতেই ছিল না কোন পূর্বাভাস। ১৯৩৯-এ প্রথমে তিনি নিজের ওকালতি পেশা থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নেন। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি আরো অনেক বেশি চমকপ্রদ। কাউকে কিছু না জানিয়ে ১৯৩৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ মহাত্মাজীর আদর্শবাদী পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত করেন।তারপর দীর্ঘ ন'বছর বাদে আবার একদিন হঠাৎই রাজনীতির জগৎ থেকে চির অবসর নিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবনের তৃতীয় অধ্যায় — সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য রচনা। তারপর আমৃত্যু তিনি কেবলমাত্র নিয়োজিত ছিলেন সাহিত্য রচনায় — যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি 'জাগরী', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-র মত উপন্যাস এবং 'গণনায়ক', 'বন্যা', 'চরণদাস এম-এল-এ', 'চাকাচকী' প্রভৃতির মত অনবদ্য সব ছোটগল্প। এছাড়াও আমরা সতীনাথের অন্যান্য বিষয়ের সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত বেশকিছু পেয়েছি। সতীনাথ ছিলেন চির অতৃপ্ত, চির পিপাসু। সারা জীবন ব্যাপী মানুষকে দেখে তাদেরকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাদের ব্যাথায় সমব্যাথী হয়ে উঠেছেন। আর এই বিপুল জনসংযোগ, সংবেদনশীল মননশীলতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে সতীনাথের ছোটগল্পের বিষয় এবং চরিত্রেরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে জীবন-চিত্রণ।।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম আবির্ভাব। প্রায় অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ভাবেই সতীনাথ সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চল্লিশের দশক সতীনাথের জীবনের পালাবদলের বেলা। কারণ এই চল্লিশের দশকের গোড়াতেই সতীনাথ তাঁর সম্ভ্রান্ত সচ্ছল নিশ্চিত পারিবারিক ও ওকালতি জীবন ছেড়ে একেবারে আকস্মিক ভাবেই একদিন রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন। তারপর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে রাজনীতিকে গ্রহণ করে দেশ ও মানবসেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই আবার

কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিয়ে পা বাড়ালেন সাহিত্য জগতে। যদিও রাজনীতির জগতে থাকাকালীনই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্য সাধনা এবং তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো উপন্যাস 'জাগরী'ও (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রাজনীতির জগতে থাকা কালীনই। তবে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে সতীনাথ পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হলেন। সতীনাথ চিরকালই ছিলেন প্রচার বিমুখ। আত্মমগ্ন-সতর্ক আত্মসমালোচক। তাই প্রচার-বিমুখ, নিভৃতবাসী লেখক সতীনাথ শহর কলকাতার সাহিত্য পরিমণ্ডল থেকেই অনেকটা দূরে জন্মভূমি পূর্ণিয়ায় বসেই আজীবন সাহিত্য সাধনা করেছেন।

ছোটগল্পকার হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত ছোটগল্পগুলির মধ্য থেকে উঠে আসা মানব জীবনের সামগ্রিক চিত্রণে আমরা বারংবার দেখেছি সতীনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ছোটগল্পগুলিতে কীভাবে এক-একটা ব্যক্তি চরিত্রকে ধরে, সেই চরিত্রের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা আচরণ কিংবা অভ্যাসকে তুলে ধরেছেন পক্ষপাতহীন নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টির প্রেক্ষিতে। প্রত্যেকটি গল্পে সতীনাথের চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব পাঠককে আকর্ষণ করে। সতীনাথ তাঁর রচিত ছোটগল্প গুলির মধ্য দিয়ে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বর্ণ-শ্রেণীর মানুষের সামগ্রিক জীবনের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সতীনাথ তাঁর কলমে এমন-এমন কিছু চরিত্রকে তুলে ধরেছেন, কিংবা এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষের কথা বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের পাঠক-সমালোচক-গবেষক প্রত্যেকেই তাঁদের জানা-চেনা গণ্ডীর অনেকটা বাইরের পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনায় আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে — বাংলার এবং ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরের পট-পটভূমি, সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে পাঠক একটা সার্বিক-সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লেখা সতীনাথের গল্পগুলিতে একদল স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক মানুষের আসল চেহারাকে স্পষ্ট করেছেন। 'গণনায়ক'-এই শ্রেণীর একটি অন্যতম গল্প। দেশ ভাগের নামে বাংলা-বিহার সীমান্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা জেগেছিল তাকে কেন্দ্র করে 'মুনীমজী'-র মত সুবিধাবাদী-মুনাফালোভী মানুষ যে নোংরা খেলায় মেতে উঠেছিল তাকেই তুলে ধরেছেন 'গণনায়ক' গল্পটির মধ্য দিয়ে। 'গণনায়ক'-এর মত 'চরণদাস এম-এল-এ' কিংবা 'পরকীয় সন-ইন-ল' গল্পেও সতীনাথ সেই শ্রেণীর মানুষের চরিত্রের আসল রূপকে তুলে ধরেছেন — যাঁরা যোগ্যতার ভিত্তিতে চূড়ান্ত অসফল হলেও কায়েমী ক্ষমতা বলে বিশেষ বিশেষ পদাধিকারী হয়ে দেশের-দশের উন্নতি সাধনের পরিবর্তে প্রবল ক্ষতি সাধন করেন আর নিজের আখের গুছিয়ে নেন।

তৃতীয় অধ্যায়
সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে বাক্-নির্মাণ

অভিসন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের বাক্-নির্মাণ কীভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিষয় বৈচিত্র্য, গঠন নৈপুণ্য, ঘটনা বিন্যাস, কাহিনী সংস্থাপন ও ভাষা ব্যবহারে সতীনাথের ছোটগল্পগুলি যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে তা অনবদ্য। সামাজিক দায়-দায়িত্ব-অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শিল্পরূপ দিতে পায় সতীনাথ তা জানতেন, তাঁর গল্পের দর্পনে ভেসে ওঠে আমাদের সমাজের চোরা স্রোতের রূপ। এই অধ্যায়ে আলোচনায় অনিবার্য ভাবে উঠে এসেছে সতীনাথের আঙ্গিক পরিকল্পনা বা নির্মাণ, ভাষার ব্যবহার, শব্দ নির্মাণ-শব্দচয়ণ-শব্দ ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য। সতীনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলি রচনার ক্ষেত্রে ভাষাকে এমন শাণিত ভাবে ব্যবহার করেছেন যে — তাঁর অভীষ্ট উদ্দেশ্য, তাঁর লক্ষ্য অনায়াসেই পূর্ণতা পেয়েছে। প্রতিটি গল্পেই কাহিনী ও চরিত্রকে সঠিক রূপ দান করতে তিনি যেভাবে বিষয়োপযোগী ভাষা ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন, তা যেমন গল্পগুলিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি শিল্প রূপের বিচারেও সার্থক মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। নিজের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অচঞ্চল নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় সতীনাথের ছোটগল্পগুলি স্বাদে-বৈচিত্র্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। সহজ-সরল-সাবলীল অথচ অনলংকৃত ভাষার ব্যবহারে গূঢ় কিংবা সহজ যেকোন বিষয়কে সমান দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা যায় — সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চতুর্থ অধ্যায়
সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যায়ন

জীবন সত্য ও মানব সত্যবোধের, প্রকৃত সহৃদয়, দরদী মনের অন্তর্শক্তিতে দৃঢ় শক্তিমান লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথের সবচেয়ে বড় গুণ তিনি নিজের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সতীনাথ সর্বদা কোন কাজের আগে এবং পরে নিজের সন্দিহান মন নিয়ে আত্মসমালোচনা করতেন। নিজেকে তিনি কখনো প্রচারের আলোতে আনতে চাননি। এই অধ্যায়ে আমরা সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের গল্পের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে সতীনাথ

ভাদুড়ীর অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্যকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। বাংলা কথা সাহিত্যে যে সময় সতীনাথ ভাদুড়ীর আবির্ভাব সেই সময় তথা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকের কথা সাহিত্য মূলত দেশ-কাল-সময় জীবনের অস্থিরতা-দ্বিধা ও সংশয় চিহ্নিত। সতীনাথ ভাদুড়ীর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় উঠে এসেছে সতীনাথের বিশিষ্টতা-স্বতন্ত্রতা। সতীনাথ ভাদুড়ীর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের লেখা ছোটগল্পের মূল তাৎপর্য-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তার সঙ্গে সতীরনাথের ছোটগল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোচনায় উঠে এসেছে সতীনাথের অনন্যতা-অদ্বিতীয়তা। তাঁর সমসাময়িক ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী বা বিমল কর এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে এঁরা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পের জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কেউবা তীব্র ব্যাঙ্গের কষাঘাত, কেউ সরস জীবনদৃষ্টি, কেউ বাস্তব জীবনমুখী-প্রতিবাদী মানসিকতায় লেখনীর আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য সব ছোটগল্পকে। সতীনাথ এই একই সময়ের লেখক হয়েও নিজের ব্যতিক্রমী স্বভাব, জীবন দর্শন আর অভিজ্ঞতার অমৃত সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র-বৈচিত্র্যময়। সতীনাথ এমন একজন লেখক যাঁর জীবনে আবেগের পরিবর্তে বাস্তবতা, প্রকৃত সত্য, গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছে।

তাই সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে — সতীনাথের সমকালের সকল ছোটগল্পকারেরা তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে, শিল্পকলার কৌশলে যেমন সার্থক, যেমন উজ্জ্বল — তেমনি বাংলার ভৌগোলিক সীমান্তের বাইরে বিহারের একটি প্রান্তিক শহরে বসে নিজস্ব জীবন দৃষ্টি এবং আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিহারের জল-বায়ু-প্রকৃতি এবং মানুষকে ভালোবেসে প্রচারের বা জনপ্রিয়তার মত সস্তা চাহিদাকে জয় ক'রে নিরালায় নির্বিঘ্নে বসে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর অসীম পর্যবেক্ষণ শক্তি, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার সমন্বয়ে যে সাহিত্য তথা ছোটগল্পগুলি রচনা করে গেছেন, তা যেমন বিষয় বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল, তেমনি শিল্প সুষমায় পূর্ণ স্নাত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা ছোটগল্পকে অনেকটা উচ্চাসনে বসাতে সক্ষম হয়েছে তেমনি এক মহৎ ছোটগল্পকার রূপে সতীনাথ ভাদুড়ী চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

উপসংহার

সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন মূলত দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। সতত সন্ধানী এই মানুষটি সারা জীবন ধরে সন্ধান করেছেন জীবনের অন্বিত সত্যকে। সেই জীবনের ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের অমৃত আস্বাদন হৃদয় নিয়েই সতীনাথ প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্য জগতে।প্রেক্ষিতে উত্থিত গরল কিংবা অমৃতকে পরিবেশন করেছেন নিরপেক্ষ ভাবে। তাঁর সমসাময়িক সকল ছোটগল্পকারেরা তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে শিল্পকলার কৌশলে যেমন সার্থক ও উজ্জ্বল তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ীও বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে দূরে অবস্থিত থেকে কেবলমাত্র নিজের বলিষ্ঠ জীবন দর্শন, আদর্শ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে জীবনমুখী ছোটগল্প রচনা করে কালের প্রবাহে অমর হয়ে রয়েছেন।

——oo——